বাঙালি কিছু ভাবনা

শিবনারায়ণ রায়

ঝিবিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় গবেষণার সময় থেকেই শ্রদ্ধাভাজনঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।তাঁকে প্র করি, বাঙালির আদিপর্বের ইতিহাস অসামান্য গ্রন্থবটে, কিন্তু যে সময়কালের বিবরণ আপনি দিয়েছেন তখন কি বাঙালি নামে সত্যিইকোনো জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল? আদিপর্বে তো ভারত উপমহাদেশেরএই পূর্ব াঞ্চল—যাকে আমাদের সময়ে আমরা অবিভক্ত বঙ্গদেশ বলতাম—তাতো ছিল অনেকগুলি স্বতন্ত্র জনপদে বিভক্ত। গৌড়, সমতট, হরিকেলা, রাঢ়,পৌণ্ড্র, বরেন্দ্র, তাম্রলিপ্ত, সুবর্ণবীথি, বঙ্গাল, বর্ধমানভুক্তি ইত্যাদির সঙ্গে বঙ্গ নামেজনপদের উল্লেখও মেলে বটে, কিন্তু আয়তনে তা নিতান্তই ছোট, এবংতার চৌহদ্দি বস্তুত প্রায় অনির্দিষ্ট। শশাঙ্ক থেকে পাল বা সেনরাজারা কেউই এই অঞ্চলকে কোনো ঐক্যে বাঁধতে পারেন নি। তাহলে এইযুগের বিবরণকে বাঙালির আদিপর্ব বলে নামকরণের সার্থকতা কী?

উত্তরে নীহাররঞ্জনের বক্তব্য ছিল, এই অঞ্চলের অধিবাসীদেরঅনেকগুলি সামান্য লক্ষণ আদিপর্বেই গড়ে ওঠে। পরে মধ্যপর্বে বা মুসলমানআমলে তা পরিস্ফুট হয়ে বাঙালি জাতির রূপ নেয়। তাঁর এই উত্তর আমারকাছে প্রমাণসিদ্ধ ঠেকে নি। প্রাক্-মুসলিম যুগে এই সমগ্র অঞ্চলেরঅধিবাসীদের এমন কোনো লক্ষণরাজির পরিচয় মেলে না যাকে সার্বত্রিক এবংবিশিষ্ট বলা চলে। মধ্যপর্ব নিয়ে তিনি কেন লিখলেন না জিজ্ঞাসা করায় তিনিদুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেন ফার্সিভাষা ন া জানা থাকায় এই প্রয়োজনীয়কাজটিতে তিনি হাত দিতে পারেন নি। আমার ছাত্রাবস্থায় ঝিবিদ্যালয়েফার্সির একজন অধ্য াপক ছিলেন, কিন্তু ছাত্র ছিল না।

আমার ধারণা বাঙালি সংক্রান্ত অধিকাংশ আলোচনারগোড়ায় গলদ এখানেই। যে পর্বে বাঙালি নামে জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে সেটিরসূচনা এবং প্রাথমিক বিকাশ যে আসলে মুসলমান আমলেই ঘটে, বাঙালি হিন্দুঐতিহাসিক এবং অন্য আলে াচকদের মধ্যে অধিকাংশই এ সত্য স্বীকারে অনাগ্রহী এবংএই সত্যের সুদূরব্যাপী অর্থবিচারে অনিচ্ছুক। বাঙালি জনগে াষ্ঠীর ঐক্য এবংস্বাতন্ত্র্যের মুখ্য অবলম্বন বাংলা ভাষা এবং বাংলা অক্ষরমালা এবং দুটিরইউদ্ভব এবং বিকাশ ঘটে মুসলম ান রাজত্বকালে।

বাঙালি পণ্ডিতরা চর্যাপদকে বাংলাভাষার আদি নমুনা বলে গণ্যকরেন বটে, কিন্তু উত্তরভারতীয় অবাঙালি পণ্ডিতরা একথা মানেন না। বাংলারসর্বদেশব্যাপী একটি সাহিত্যিক ভাষা রূপ নেয় পাঠান আমলে। আর সেইসদ্যোজাত বাংলাভ াষার মস্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুসলমান সুলতানেরা।পরে এই অঞ্চলকে সাময়িকভাবে সর্বভারতীয় এক শাসনব্যবস্থার অধীন করেতার সাধারণ নাম সুবাবাংলা দেন মোগলরা।

এক ভাষা এবং এক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠারফলে বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হন বটে, কিন্তু এই ঐক্যর চেতনা প্রথমপরিস্ফুট হয়ে ওঠে উনিশ শতকে ইংরেজের শাসনকালে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকেরবীন্দ্রনাথ সকলেই উল্লেখ করেছেন যে ন্যাশন্যালিজম্ বা স্বদেশপ্রেম এদেশে পশ্চিমের আমদানী। ভারতীয় চিন্তার পরম্পরায়নেশ্যন তথা ন্যাশন্যালিজ্মের উপস্থিতি তাঁরা দেখতে পাননি। পনেরো ষোল শতক থেকেপশ্চিমে ন্যাশন্যালিজম্-এর অভীপ্সা স্পষ্ট হয়; উনিশ শতকে তার বিশেষপ্রাবল্যের সময়ে ঐ ধ্যানধারণা এদেশের শিক্ষিত মনেও ইংরেজির সূত্রেছড়িয়ে যায়। এবং যেহেতু কলকাতা ছিল ভারতে ইংরেজের রাজধানী আরমধ্যবিত্ত শহুরে বাঙালিই সব চাইতে সযত্নে ইংরেজির পাঠ নিয়েছিল, এখানেইভারতের অন্য অঞ্চলের তুলনায় প্রথমে ন্যাশন্যালিজ্‌ম্ সব চাইতেপ্রবল হয়ে ওঠে।

কিন্তু ন্যাশন্যালিজ্‌মের মন্ত্রেদীক্ষা নেবার পর বেশ কয়েকটি সমস্যা ও অন্তর্বিরোধও স্পষ্ট হয়েওঠে। ইংরেজের সূত্রে ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌ বা জাতিপ্রেমের আদর্শ শিক্ষিতশহরবাসী মুখ্যত উচ্চবর্ণ এবং মধ্যবিত্ত হিন্দু-বাঙালির মনে সঞ্চারিত হয় বটে,কিন্তু জাতিবৈর ছাড়া জাতিপ্রেম প্রবল হতে পারে না। কথাটাবঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছিলেন। অর্থাৎ স্বজাতিরপ্রতি আনুগত্যের প্রাবল্য অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষেরতীব্রতার ওপরে নির্ভর করে। ইংরেজের জাতিপ্রেম প্রথমে স্পেন,পরে ফ্রান্স, পরে জার্মানিকে মুখ্য শত্রু রূপে আক্রমণের লক্ষ্য হিশেবেপেয়েছিল। স্বভাবতই বিদেশাগত শাসক এবং শোষক ইংরেজ আমাদের জাতি-শত্রুহিশেবে গণ্য হবার কথা। কিন্তু পুরো উনিশ শতক জুড়ে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকেও সারা ভারতে বাঙালি উচ্চবর্ণের হিন্দু যে প্রাধান্য পায়তার সূত্র ছিল ইংরেজি শিক্ষা এবং ইংরেজি শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা।ভারতের যেখানে-যেখানে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা পায় সেখানেই বিদেশীশাসকদের সহযোগী হিশেবে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি চাকরি এবং পেশার সূত্রেপ্রধান হয়ে ওঠে। ফলে একদিকে জাতিপ্রেম সূত্রে ইংরেজ বিদ্বেষ এবংঅন্যদিকে বৈষয়িক স্বার্থে এবং আধুনিক ধ্যানধারণা ও জীবনযাত্রার আকর্ষণেইংরেজপ্রীতি, এই দুয়ের টানাপোড়েন সারা উনিশ শতক ধরেশিক্ষিত হিন্দু বাঙালির মধ্যে কমবেশি দেখতে পাই।

মুখ্যত ইংরেজিশিক্ষার ফলেই এ দেশের শিক্ষিত মনে পরাধীনতা বিষয়ে গ্লানিবোধ এবংরাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জনের অভীপ্সা ক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তুসঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে শিক্ষিত বাঙালির কাছে লৌকিক জীবনেউৎকর্ষের মডেল ছিল শিক্ষিত ইংরেজ। যে সব গুণ অর্জনের ফলেনিতান্ত ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী ইংরেজ বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারীহয়—বিজ্ঞান চর্চা এবং তার ব্যবহারিক প্রযুক্তি ;ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সুনিপুণ সংগঠন শক্তি, প্রাতিস্বিক উদ্যোগ এবং অদম্যকর্মশক্তি, সময়নিষ্ঠা এবং দায়িত্ববোধ ইত্যাদি—সেগুলির অর্জন ওঅনুশীলন শিক্ষিত বাঙালির কাম্য হয়ে ওঠে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর,বঙ্কিমচন্দ্র, ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ, মায় রবীন্দ্রনাথে পর্যন্ত এই মডেলেরঅতি সুফলপ্রসূ প্রভাব দেখতে পাই। এমনকি নামেমাত্ররামকৃষ্ণকে সামনে রেখে কর্মযোগী বিবেকানন্দ যে সংগঠনেরপ্রতিষ্ঠা করেন তাতেও প্রাচীন ভারতের চাইতে নব্যপশ্চিমের আদল বেশি প্রত্যক্ষ। বিদেশীরা এখনো পর্যন্ত দলে-দলে গোলপার্কের মিশনেই এসে ওঠে, কারণ এখানে তারা তাদের অভ্যস্তজীবনযাত্রার অনেক বৈশিষ্ট্যই দেখতে পায় এবং ফলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

মোদ্দা এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে বাঙালির জাতীয়তাবাদেরইংরেজ বিদ্বেষ এবং ইংরেজ প্রীতি প্রায় অচ্ছেদ্যভাবে মিশে যায়।এরই পাশাপাশি দ্বিতীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রও প্রকট হয়ে ওঠে। কীনির্ণায়ক দিয়ে স্বজাতি বা স্বদেশের বিশিষ্ট ঐক্য স্থিরীকৃত হবে?উনিশ শতকে ন্যাশন্যালিজ্‌মের প্রভাবে একদিকে যেমন শিক্ষিত বাঙালিতাঁদের গোষ্ঠীসত্ত্বাগত বাঙালিত্ব বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠলেন এবং তাঁদেরআন্তরিক প্রযত্নে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের লক্ষণীয় বলাধানঘটল, অন্যদিকে আবার বৃহত্তর জাতিসত্তার অন্বেষণে তাঁদের মন ভারতীয়ত্বআবিষ্কারেও উন্মুখ হল। কিন্তু কোন ভারত? রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথসকলেরই ঝোঁক প্রাক্‌-মুসলিম ভারতীয় ঐতিহ্যের উপরে—বেদ,বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ, গীতা, সংস্কৃত সাহিত্য ইত্যাদিকেই তাঁরা ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মুখ্যউপাদান বলে ধরে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বুদ্ধের অনুরাগী ছিলেন কিন্তুতাঁর 'অনাত্তবাদ' বা নির্বাণতত্ত্ব তাঁকে আকৃষ্ট করে নি।অপরপক্ষে প্রায় সাত-আটশো বছর ধরে এই উপমহাদেশে সাহিত্যে,শিল্পকলায়, স্থাপত্যে, সংগীতে, পোশাক-আশাকে, রন্ধন বিদ্যায়, শাসনব্যবস্থায়, উদ্যান চর্চায় মুসলমান শাসক সমাজ যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রচনাকরেছিলেন তাকে তাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্য হিশেবে ভাবতে শেখেননি। এ সমস্যাএখনও রয়ে গেছে। তবে বিশেষ করে বাংলার ক্ষেত্রে এই তথাকথিত ভারতীয়ঐতিহ্যের সঙ্গে বাঙালির বিশিষ্ট ঐতিহ্যকে মেলাবার চেষ্টার মধ্যেবিস্তর গোঁজামিল রয়ে যায়। বাঙালির ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, তারলোকজীবনের বিচিত্র বহুবর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই তথাকথিত ভারতীয়আর্য ঐতিহ্যের সম্পর্ক কতটুকু? হিন্দু বাংলার যে দেবীপূজাকে নিয়েবঙ্কিমের বন্দেমাতরম্‌ তার সঙ্গে পুষপ্রধান ব্রাহ্মণ্যসমাজসংস্কৃতি কীসূত্রে মিলবে? বাংলার ভূ-প্রকৃতিকে বন্দনা করে রবীন্দ্রনাথ যে সব স্বদেশী গানবেঁধেছেন তারা কতটুকু সাড়া তুলতে পারে রাজস্থানে বাতামিলনাড়ুতে? শিক্ষিত হিন্দু বাঙালির স্বাদেশিকতার মূল উৎসবাংলাদেশ ; ভারতীয় ন্যাশন্যালিজ্‌মের উল্লেখ বারে-বারে করলেওমনের গভীরে আজও তা খুব একটা সাড়া তোলে না। দেশ স্বাধীন হবার পর হিন্দীরআগ্রাসী বিস্তার পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির স্বজাতিপ্রেমের দুর্বলতা,অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ব্রাত্য রূপটিকে স্পষ্টতর করে তুলেছে।

বাঙালির সমস্যা বাঅন্তর্দ্বন্দ্বের শেষ এখানেই নয়। যুক্ত বাংলার সংখ্যাগু সম্প্রদায় ছিলমুসলমান ; কিন্তু দেশবিভাগের

পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গসংস্কৃতির মৌরসিপাট্টা দখল করে বসেছিলেন বাঙালি উচচবর্ণের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু। বাঙালিমুসলমানের ধর্ম, সমাজ-পরিবার সংগঠন, আচার-বিচার, মৌখিক ভাষা এবংলিখিত সাহিত্য সম্পর্কে এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী হিন্দু প্রবক্তাদের না ছিলপ্রত্যক্ষ জ্ঞান, না কোনো যথার্থ আগ্রহ। এদিক থেকে এমনকি স্বয়ংরবীন্দ্রনাথের নিদ্যোগ এক গভীর অভাবের নির্দেশবাহী। নজলের বিদ্রোহীবিস্ময়কর প্রতিভা সাময়িকভাবে হিন্দু-মুসলিম ব্যবধানকে অতিক্রমকরেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত হিন্দু চেতনায় তারকোনো স্থায়ী প্রভাব পড়েনি। ফলত বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ একদাযে বাঙালিত্বের কল্পনা করেছিলেন তাতে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়েরজীবনচর্যা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অবহেলিত, প্রায় অস্বীকৃত থেকে যায় ফলে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, বাঙালি হিন্দুর স্বাদেশিকতায়সাম্প্রদায়িকতার আত্মঘাতী মিশ্রণ ঘটে। বিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এইমনোভাবের প্রতিক্রিয়া আর অস্পষ্ট থাকে নি। এ কারণে দেশবিভাগেরসময়ে বঙ্গবিভাগ প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে। স্বাধীন বাংলাদেশেরপ্রতিষ্ঠা হওয়ার পরই নবশিক্ষিত বাঙালি মুসলমান আবার নতুনকরে বাঙালিত্ব বা বাঙালি জাতীয়তার স্বরূপ অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। সে অনুসন্ধানস্বাধীন বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতটা ফলপ্রসূ হয়েছে, পশ্চিমবাংলায় তারতুলনায় কিছুই হয় নি।

আর শেষ পর্যন্ত যেসমস্যা এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব চিরকালই ছিল এবং আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে সেটি হলওপর তলা আর নিচের তলার বাঙালির মধ্যে প্রায় অলংঘ্য ব্যবধান। ইসলামহিন্দুভারতে নিয়ে এসেছিল ঐহিক সামাজিক সাম্যের বাণী। হিন্দু সমাজের বঞ্চিতনিপীড়িত, শোষিত নিম্নবর্গের স্ত্রীপুষের অনেকেই সেই ধর্ম গ্রহণ করে।কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল এরই প্রতিক্রিয়ায় উচচবর্ণের হিন্দুদেরমধ্যে জাতপাঁতের ভেদ বরং প্রবলতর হল। চৈতন্যের সাম্যভিত্তিক ভক্তিবাদবাঙালি হিন্দু সমাজের জাতিভেদ-নির্ভর গঠনে কোনো রূপান্তরই ঘটাতেপারে নি। অপরপক্ষে মুসলমানদের মধ্যে উপর তলার মানুষরা নিজেদেরআশরাফ বলে জাতীয় ঐক্যের সাধনা থেকে আপনাদের সরিয়ে রাখলেন, আরনিচের তলাতেও ধর্মান্তরিতদের মধ্যে হিন্দুদের মতো জাতপাঁতের ভেদবেশ খানিকটা রয়ে গেল। অর্থাৎ সমগ্রভাবে অভঙ্গ বঙ্গ দেশে এমন একটি সমাজ গড়েওঠেনি যা কোনো জাতীয়সংস্কৃতিতে সমভোগী। দেশভাগের পরেও উচচবর্গ এবংনিম্নবর্গের ব্যবধান দুই বাংলাতেই রয়ে গেছে। এবং যে সামাজিক গতিশীলতার ফলেএই ব্যবধান দূর হতে পারে তার বিশেষ চিহ্ন এখনো চোখে পড়ে না।

।।দুই ।।

এতসব অন্তর্দ্বন্দ্ব সমস্যা এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিকপ্রতিকূলতা সত্ত্বেও উনিশ শতকে মুখ্যত কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটিসাংস্কৃতিক-সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে যার নীট ফল মোটেই তুচ্ছ করবারনয়। আমার নানা লেখায় এই আন্দোলন এবং তার সুফলকে আমি বঙ্গীয় রেনেসাঁস নামে সম্বোধিত করেছি। এখানে তা নিয়ে আবার আলোচনা করবনা। শুধু এটাই স্মরণ করতে চাই যে মাত্র এক শতকের মধ্যে বাংলা ভাষা ওসাহিত্যের যে অসামান্য সমৃদ্ধি ঘটে চার-পাঁচশো বছর আগেকার ইতালীয়রেনেসাঁসের তুলনায় তা মোটেই কম বিস্ময়কর নয়। রামমোহন,ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মাইকেল, বঙ্কিম থেকে শু করেসারা উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রায় প্রথমার্ধ জুড়ে যে সব অসংখ্যব্যক্তিত্বের উদ্ভব ঘটে, এই অঞ্চলের পূর্ববর্তী দীর্ঘ ইতিহাসে তাদের তুলনা মেলাকঠিন। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মসমাজেরভাবুক এবং কর্মীরা একদা যে রূপান্তর সূচিত করেছিলেন, তার ধারাপরবর্তীকালে ক্ষীণ হয়ে এলেও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য মোটেই কম নয়।বঙ্কিমচন্দ্র শহর-মফস্বলের 'বাবু' নামধারী যে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীরপুষদের আপজাত্যকে তীব্রভাষায় কষাঘাত করেছিলেন, তাদের বংশধরদেরমধ্যে অনেকেই নৈতিক পতনের হাত থেকে ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনরক্ষা করে। মুখ্যত ব্রাহ্মপ্রভাবেই বঙ্কিমোক্ত শূন্যগর্ভ'বাবু'-দের অনেকটাই সরিয়ে দিয়ে দেখা দেয় নীতিবোধ সম্পন্ন নতুনএক ভদ্রশ্রেণী।

এই নবোদ্ভূত ভদ্রশ্রেণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এটির সদস্যরাশিক্ষিত এবং চিবান ; তারা স্ত্রীশিক্ষায় যথার্থই আগ্রহী এবং পরিবার ছাড়াও পরিবারের বাইরে বৃহত্তর সমাজ জীবনে স্ত্রীলোকেরভূমিকার প্রসারে উদ্যোগী। তারা পশ্চিমাগত ভাবনাচিন্তা,জ্ঞানবিজ্ঞানকে স্বাগত করলেও একই সঙ্গে দেশপ্রেমী। আত্মমর্যাদার সঙ্গেসৌজন্যবোধ, সুচির সঙ্গে সংযম, স্বাধীনচিত্ততার সঙ্গে নিয়মানুগত্য,কর্তব্যনিষ্ঠা এবং যুক্তিশীলতা—এসব গুণ তাদের স্বীকৃত আদর্শ।

বলাই বাহুল্য ভদ্রলোকদের চরিত্রেও ত্রুটির অভাব ছিল না। এবংসমাজের যারা নিম্নস্তরের অধিবাসী, প্রকৃতপক্ষে সম

াজের যারাঅধিজন, তাদের প্রতি তাঁদের দায়িত্ববোধের অভাব ছিল মারাত্মক রকমেরব্যাপক। এই ত্রুটি এবং অভাব শেষ পর্যন্ত সঙ্কটকালে এই ভদ্রশ্রেণীরবস্তুত বিলোপ ঘটায়। আজ আমি যে শহরে এখনো বেঁচে আছি সেখানে এই ভদ্রশ্রেণীরস াক্ষাৎ পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু এ কথাও ভুলতে পারি না যে বিশশতকেরগোড়ায় যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, জীবনের বড় অংশদ্বীপান্তরে বা কারাগারে কাটিয়ে ছিলেন, তাঁরা বস্তুত সকলেই ছিলেন এইভদ্রশ্রেণীর ছেলেমেয়ে। সিডিশন কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় স্বদেশীআন্দোলনে 'টেররিস্ট' নাম দিয়ে যাঁদের শাস্তি বিধ ানহয়েছিল তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ছাত্র অথবা শিক্ষক। পরবর্তীকালে যখনস্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সম াজবিপ্লবের আদর্শও যুক্ত হয় তখন সে আদর্শেআকৃষ্ট হয়ে যাঁরা জীবন পণ করেন এবং অনেকেই দীর্ঘদিন কারাবদ্ধ থ াকেন,তাঁরাও এই ভদ্রশ্রেণী থেকে এসেছিলেন। আমার জীবনে আমি খুব অল্প সময়েরজন্যই প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। কিন্তুপ্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের এমন অনেক খ্যাত-অখ্যাত রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গেআমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল যাঁরাআদর্শনিষ্ঠ, সর্বত্যাগী, সুসংস্কৃত ভদ্রসন্তান।

এই কথাটার ওপরে জোর দেবার কারণ পরবর্তীকালেশুভনাস্তিক মার্কসবাদীদের মৌখিক অপপ্রচার এবং বেহুদা কলমবা জিরজোরে 'ভদ্রলোক' শব্দটির ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। বঙ্কিমোক্ত'বাবু' এবং বাঙালি ভদ্রলোক মোটেই এক প্রকৃতির ম ানুষ ননাসমর সেন 'বাবু বৃত্তান্ত' লিখেছেন ঃ অবশ্যই বিশ শতকেরকলকাতায় 'বাবু' কুলের ব্যাপক প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। কিন্তুসমর সেন নিজে ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষায়, পোশাক-আশাকে, সৌজন্যে,সামাজিক দায়িত্ববোধে যথার্থ ভদ্রলোক। 'বিপ্লবের' আদর্শে তাঁরআস্থা থাকলেও তিনি তাঁর চরিত্রে বা জীবনযাত্রায় মোটেই বিপ্লবীছিলেন না।

আমার শৈশব কৈশোর এবংযৌবনের সূচনাপর্ব কেটেছে মুখ্যত এই ভদ্রশ্রেণীর জগতে। পিতাকে দেখেছিচবিবশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টা অধ্যয়ন অথবা অধ্যাপনায় মগ্ন। বিবেকীএবং সহৃদয়, আত্মপ্রত্যয়ী এবং মানবহিতৈষী মানুষটি বহু স্ত্রীপুষের আদর্শএবং আশ্রয়স্থল ছিলেন। বহু শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, সাংবাদিককেজানবার সৌভাগ্য হয়েছিল যাঁরা অ াপন সাধনায় অভিনিবিষ্ট। বস্তুত বঙ্গীয়রেনেসাঁসের সূর্যাস্ত বিভায় স্নান করে আমি বড় হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ তখনোকল্পনার দুঃসাহসী প্রাবল্যে ছবির জগতে বিপ্লব ঘটাচ্ছেন। সবুজপত্র-রপরে কল্লোল, কালিকলম, বিচিত্রা, পরিচয়, কবিতা, পূর্বাশা এবংঅবশ্যই প্রবাসী বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের সাহিত্যচিকেপুষ্ট করে চলেছে। ৰিবিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন রাধাকৃষ্ণণ, সুরেন্দ্রনাথদাশগুপ্ত, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, তারকনাথ সেন, অমিয় চত্রবর্তী এবং আরো বহুবিবুধান অধ্যাপক। আমার জীবনের প্রথমভাগ নানা সংকট এবং আর্থিকঅনটনের ভিতরে কেটেছে, কিন্তু যে সাংস্কৃতিক পরিবেশে আমি বেড়ে উঠেছিত ার মধ্যে দীনতার স্পর্শ ছিল না। সেদিনের সেই ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরিরবিরাট রোটান্ডা, খোলা তাকের পর তাকে, নিচ থেকে সিলিং পর্যন্তসম্ভবত লক্ষাধিক বই আগ্রহী পাঠকদের জন্য অপেক্ষমাণ। উদ্যোগী এবংঅন্বেষ্টা নাগরিকদের স্বাধীন সম্ভোগের জন্য স্থানে কালে পরিব্যাপ্ত মানসঐর্যের এমন অপরিমেয় আয়োজন আজকের দিনে একেবারেই অকল্পনীয়,প্রায় অৰিাস্য।

।। তিন ।।

এক দশকের মধ্যে এই ছবি একেবারে পালটে যায়। চল্লিশেরদশকে এল ৰিব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, কলকাতায় ব্ল্যাক-আউট, জাপানী বোমা,এবং জাহাজডুবির আগে সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মতো কলকাতা থেকে পলায়নেরহিড়িক। তারপর নামল মানুষের তৈরি মহামন্বন্তর, 'ফ্যান দাওফ্যান দাও'-এর মর্মান্তিক নিষ্ফল কান্না, আর শহরের সড়কে গলিতেবারান্দায় অসংখ্য কঙ্কালসর্বস্ব মৃতদেহ। সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতারবিপর্যয় সামলাবার আগেই বাধল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মৃত্যুর কোনো র ূপই আরগোপন রইল না। একটির পর একটি আঘাতে বাঙালি ভদ্রশ্রেণীর শিরদাঁড়াপ্রায় ভেঙে গিয়েছিল। শিক্ষিতদের সঙ্গে নিম্নবর্গের অধিজনদের আত্মিকযোগাযোগ থাকলে সেদিন হয়তো এ দেশে বিপ্লব ঘটতেও পারত ;কিন্তু তা ঘটেনি। তারপর এল দেশ বিভাগ, অসংখ্য উৎখাত, নিরাশ্রয়স্ত্রীপুষের প্রবল প্রবাহে ভেঙে পড়ল এখানকার নাগরিক জীবন।উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রথমভাগ ধরে বঙ্গীয় সমাজসংস্কৃতির যেনবজাগরণ ঘটেছিল তার উপরে চল্লিশের দশকে নেমে এল কৃষ্ণ যবনিকা।তার সঙ্গে বিলুপ্ত হল কলকাতার ভদ্রশ্রেণী এবং তাদের সযত্নে গড়ে তোলা রীতিনীতিসমাজ সংস্কৃতি।

এই ঐতিহাসিক পঞ্চমাঙ্ক মহাট্রাজেডির আমি একজনপ্রত্যক্ষদর্শীও বটে, নিতান্ত সামান্য কুশীলবও বটে। ভাবতে আশর্চর্যল াগে এই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গিয়েও আমি শেষ পর্যন্ত তলিয়ে যাইনি,এমনকি সম্ভবত আমার মনুষ্যত্বের (বাঙালিত্বের

নয়) বেশ কিছুটাই আজপর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি। গত পঞ্চাশ বছর ধরে একদিকে যেমনছোট-বড় চেষ্টা চলছে বিভক্ত দুই বাংলাতেই স্বতন্ত্রভাবে বাঙালিজাতিকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার, অন্যদিকে তার চাইতেওঅনেক বেশি প্রবলভাবে কাজ করছে আপজাত্যমুখী বিভিন্ন শক্তি। পূর্ব বাংলাতথা স্বাধীন বাংলাদেশে দুর্বল অসংগঠিত নেতৃত্ববিহীন অ াধুনিকতামুখী শক্তিরাআগ্রাসী, বিচারবিমুখ, উগ্র ধর্মধবজীদের প্রবল আক্রমণে সম্প্রতিবিপর্যস্ত। তবু যে বিস্তর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা এ তাবৎহার স্বীকার করেনি, লড়াই করে চলেছে, এটাই আশার কথা। একুশ শতকেবাঙালির যদি আবার একটি রেনেসাঁস হয়, তা শেষ পর্যন্ত সম্ভবত স্বাধীনবাংলাদেশেই প্রথম সূচিত হবে।

অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গেআশার চিহ্ন দুর্লক্ষণীয়। বিগত বিশ-তিরিশ বছরে এখানকারশিক্ষাব্যবস্থা একেবারেই বিপ্রকীর্ণ। একদিকেবিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যাচর্চার মান নাটকীয়ভাবে নিম্নগামী ;অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় অচল। স্বাধীনত ারপঞ্চাশ বছর পরেও অর্ধেক স্ত্রীপুষ নিরক্ষর রয়ে গেছে। গত বিশ বছর ধরেদেখছি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা মেধাবী ও কৃতী ছাত্রছাত্রী তারা সুযোগ পেলেইদেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে যাচ্ছে এবং তারা আর ফিরছে না। তারা অনেকেইঅন্য দেশে কৃতিত্ব অর্জন করছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উজ্জীবনে তাদের যে ঐতিহাসিকভূমিকা থাকবার কথা সে স ম্পর্কে তারা হয় অচেতন, নয় অনাগ্রহী। এদিকেএখনকার রাজনৈতিক আর্থিক সাংস্কৃতিক জীবনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে দুর্নীতি বাস াবেঁধেছে। যারা ঘুষ দেয় অথবা ঘুষ খায় তিরিশের দশকেও তারা ভদ্রসমাজেকলকে পেত না। এখন মন্ত্রী থেকে বিভিন্ন পদের আমলা, নির্বাচিতপ্রতিনিধি থেকে ছোটবড় ব্যবসাদার, ঘুষ ছাড়া কারো কাজকারবার চলেনা। এখন পাড়ায়-পাড় ায় মস্তান-মাফিয়াদের রাজত্ব। রাজনৈতিক নেতাঅথবা বিত্তবান ব্যবসায়ীরা তাদের পৃষ্ঠপোষক, পুলিশদের সঙ্গে তাদেরভ াগবাটোয়ারার কারবার। অধ্যাপকরা বিদ্যাচর্চায় অনাগ্রহী, সম্পাদকেরামালিকদের মুখাপেক্ষী, প্রচারকৌশলে রদ্দিম ালও চড়া দরে বিকোয়।রেনেসাঁসের সময়ে যে সব অনন্যতন্ত্র ব্যক্তিদের উদ্ভব ঘটেছিল তাদের সঙ্গে তুলনীয়স্ত্রীপুষ স ম্প্রতিকালে বড় একটা চোখে পড়ে না। হাটেবাজারে ভাগ্যগণনারহিড়িক বেড়েছে ; বিলাসব্যসনে অপচয়ের অন্ত নেই ; নিচের দিকে গাঢ় অন্ধকার ; এদিকে ওপর মহলেরোশনাইয়ের এলাহি ব্যবস্থা। যে দেশে শতকরা সত্তর ভাগ স্ত্রীপুষদারিদ্র্যসীমার নিচে কোনো রকমে টিকে আছে সেখানে পৃথিবীর এমন কোনোবিলাস-ব্যসন নেই যা শহর কলকাতায় মেলে না অথবা এখানে যার খরিদ্দার নেই।

এই অবস্থায় বাঙালিজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আশা করা সুকঠিন। যারা স্বাধীনতার অথবাসমাজবিপ্লবের আদর্শে একদিন উদ্বুদ্ধ প্রাণপাত করেছিল, অথবা যারান্যায়, সততা সৌজন্য এবং সংযমের ভিত্তিতে পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনযাত্র াএক সময়ে গড়ে তুলেছিল, সেই দেশপ্রেমী, বিপ্লবী কিংবা ভদ্রলোকেরাএখন বস্তুত স্মৃতিতে পর্যবসিত। বর্তমানে যেভাবে নিষ্কুশ ভোগস্পৃহা,বিবর্ধমান লোভ, নির্বিবেক স্বার্থবুদ্ধি, সমাজ ও পরিবেশের প্রতিদায়িত্বহীনতা শিক্ষিত উচচবর্গের বাঙা লি তণতণীদের মধ্যেপ্রসারলাভ করছে, তার গতিরোধ না করতে পারলে বাঙালি জাতিরভবিষ্যৎ নিতান্তই অন্ধকার। সেই গতিরোধ যারা করবেন,প্রকৃষ্টতর জীবনের আদর্শের প্রতি তণসমাজকে যাঁরাআকৃষ্ট করবেন, সমাজ রূপান্তরের উদ্যোগে তাঁদের সংযুক্তকরবেন, সেই শিক্ষক সংগঠকদের জন্য দেশ অপেক্ষা করছে। যথা সময়ে যদিতেমন বিবুধান এবং আদর্শব াদী নেতৃত্ব না দেখা দেয়, হয়তো তাহলে একদিন নিচেরতলা থেকে বিস্ফোরণে এই ন্যায়বিদ্ধ এবং ধড়িবাজী ব্যবস্থা তছনছ হয়ে যাবে।এবং জার্মানির হবাইমার রিপাবলিকের কথা স্মরণে রেখে এ কথা নিশ্চিত মনেবলা শক্ত যে এই সামাজিক অ গ্ন্যুৎপাতের ফলে দেশের অবস্থা উন্নতিরদিকেই যাবে, আরো আপজাত্যের দিকে যাবে না। মনে রাখা দরকারহবাইমারের ফোঁপরা হয়ে যাওয়া গণতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সেখানেপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিটলারের নেতৃত্বে ভয়াবহ সর্বগ্রাসী ন াট্‌সিজুলুমতন্ত্র।

আজ যারা বাঙালি জাতির পুনর্জ্জীবন চান আমার মনে হয়তাঁদের প্রথম কাজ নিজেদের জীবনে এবং শিক্ষিত জীবনে চা রিত্রিকসততা এবং সমাজকল্যাণের কাজে দায়বদ্ধতার বোধ ফিরিয়ে আনা। এটি না হওয়া পর্যন্ত পরের কাজগুলিশুরু করা সম্ভব নয়।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com